মৃত্যুলোক মৃত্যুশোক
ও
মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০১২

সূচিপত্র

রবীন্দ্র মানসলোকের উৎস সন্ধানে	১৭
ইসলামধর্মের ইবাদৎখানায়	২১
বৌদ্ধধর্মের বোধিবৃক্ষতলে	২৯
খ্রিস্টধর্মের খোশবাগে	৪১
মৃত্যুমিছিলের মুখোমুখি	৫৫
অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো	১১৩
প্রেমের পারুল বনে	১৩৩
সৃষ্টির সোনালি খেত শিলাইদহে	১৭১
স্বপন-বপনে শান্তিনিকেতনে	২১৭
নোবেল প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট ও পরবর্তী অধ্যায়	২৫৫
মরমি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মরমের ব্যথা	২৬৭
হিন্দুধর্মের হর্ম্যতলে	৩২৫
উপনিষদের আলোকে আলোকিত রবীন্দ্রনাথ	৩৩৫
মর্ত্যে অমৃতপুত্র — মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ	৩৪৯

পরিশিষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ জীবনপঞ্জি	৩৬৯
কালানুক্রমিক গ্রন্থাবলি	৩৭২
ব্যক্তি পরিচিতি	৩৮০
তাঁর জীবিতকালে আত্মজনের মৃত্যুতালিকা	৪০১
বংশ তালিকা	৪০৩
তথ্য ঋণ	৪২৭

ইসলামধর্মের ইবাদৎখানায়

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ বলে—
লা-ইলাহা-ইল্লালাহা
মুহম্মদুর রসুল উল্লাহা

আল্লা ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। এবং মহান পয়গম্বর হজরত মুহম্মদই হলেন আল্লার প্রিয়তম রসুল। এটাই ইসলামের মূলমন্ত্র, তৌহিদের বাণী। আল্লাহ্তালার সার্বভৌমত্ব বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরান শরিফে লেখা—

"হু অল আউ অল অল আ—
খিরু অজ জা—
হিরু অল বা—
ত্বিন, অহুঅ বিকুল্লি শাইয়িন আলীম"
[সুরা হাদীদ]

তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনি স্বপ্রকট, তিনি গুপ্ত, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ইসলামধর্মের মূল পাঁচটি স্তম্ভ হল—

শাহদাহ—নমাজ—রোজা—যাকাত ও হজ।

শাহদাহ—প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্তালার সার্বভৌমিকত্বকে স্বীকার করতে হবে। মান্যতা দিতে হবে। তাঁর মহানতার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

নমাজ—প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তে হবে [ফজরের, জোহরের, আসরের, মাগরীবের ও এশার]

রোজা—প্রত্যেক শারীরিকভাবে সক্ষম মুসলমানকে হিজরি সালের নবম মাসে এক মাস রোজা রাখতে হবে।

যাকাত—আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলমান অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষকে তার আয়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান হিসাবে দিতে হবে।

হজ—শারীরিকভাবে সক্ষম ও আর্থিক সচ্ছল মুসলমানকে জীবনে একবার অন্তত মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে।

ইসলামধর্মে পাঁচটি অকর্তব্য বা ক্ষমাহীন অপরাধ—

শোরক—আল্লাহ্তালার অংশীদার দাঁড় করানো।

জেনা—অবৈধ নারী সংসর্গ।

সুদ—টাকা ধার দিয়ে মূলের অতিরিক্ত আদায়।

বেইমানি—দেয়া প্রতিশ্রুতির খেলাপ করা।

নরহত্যা—মানুষের প্রাণ নাশ করা।

ইসলামধর্ম বলে—আল্লাহ্তালা সমস্ত সৃষ্টির মালিক। চন্দ্র-সূর্য থেকে সপ্ত আসমান—সমস্ত জীব-জন্তু, পাহাড়-সমুদ্র, নদ-নদী, সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই স্রষ্টা। তিনিই প্রতিপালক। তিনিই সংহারক। তিনি মাটি থেকে পুরুষ সৃষ্টি করলেন এবং পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন নারী। নর থেকে সৃষ্টি তাই—নারী। প্রথম পুরুষ 'আদম' এবং প্রথম রমণী 'হাওয়া'। সমস্ত মানবজাতিই তাঁদের সন্তান-সন্ততি। তাঁর প্রথম প্রেরিত পয়গম্বর (নবী) 'নূহ' ও সর্বশেষ পয়গম্বর 'হজরত মুহম্মদ'।

ইসলামধর্ম ঘোষণা করে—

এ দুনিয়া হলো পরীক্ষাগার। এখানে সবাইকে আসতে হয় কাজের জন্য। ইহজীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছু নয়। এ জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে ইসলামধর্মের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনও লুকোছাপা নেই। অস্পষ্টতা নেই।

ইসলামধর্ম মতে—

পরম করুণাময় আল্লাহ্তালা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার একদিন তিনিই সংহারক হয়ে সব কিছু ধ্বংস করবেন আপন ইচ্ছায়। কোনো এক শুক্রবারে ঘটবে এই 'কেয়ামত'—ধ্বংস-মহাপ্রলয়। ইসলামধর্মে শুক্রবার অত্যন্ত পবিত্র দিন। এই দিনই সৃষ্টির প্রথম মানব 'আদমের' জন্ম। এই দিনই ঘটবে সেই বহু পূর্বে ঘোষিত মহানিপাত। শিঙা বাজবে দুবার। প্রথম শিঙাবাদনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে মারণ যজ্ঞ। সমস্ত জীবন্ত প্রাণ (কয়েকজন বাদে) অজ্ঞান হয়ে যাবে। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র হারাবে তাদের বিচ্ছুরিত তেজোরাশি। আকাশমণ্ডলী হবে বিদীর্ণ, চৌচির।

পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে ধূনিত পশমের মতো। সমুদ্র-নদ-নদী স্রোতধারা হারিয়ে সমস্ত পৃথিবী হবে সৃষ্টিহীন সমতোল। সে এক মহা উথাল-পাথাল দিন। সেদিন কবে হবে এক সুমহান আল্লাতালা ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না। বান্দা তো দূর অস্ত—এমনকি নবিরাও জানেন না।

আর দ্বিতীয় শিঙা বাজানোর সাথে সাথে সমস্ত প্রাণীকে ত্রস্ত পায়ে হাজির হতে হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে। নগ্ন পায়ে। আবরণহীন গায়ে। খাতনা বিহীন অবস্থায়। কেউ যাবে পায়ে হেঁটে। কেউ সওয়ারি হয়ে। আর অবিশ্বাসী অংশীবাদীরা যাবে মুখ দিয়ে হেঁটে—অন্ধ, মূক, বধির হয়ে। সেদিন শেষ বিচারের দিন। প্রত্যেকের কাছে থাকবে তার আমলনামা অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তার পাপ ও পুণ্যের খুঁটিনাটি হিসাব। হাদিস মতে এই বিচার পর্ব চলবে দীর্ঘ ৫০ হাজার বছর ধরে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তাদের অধিকার ছাড়াই সবকিছু দিয়েছেন, সুতরাং সেসবের হিসেব নেওয়ার সবরকমের অধিকার তাঁর আছে।

কেয়ামতের দিনে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে—তোমরা কার উপাসনা করতে? ইহুদিরা বলবে আমরা ঈশ্বর পুত্র উযাইরের উপাসনা করতাম। খ্রিস্টানরা উত্তর দেবে আমরা পরম পিতা ঈশ্বরের পুত্র মহান যিশুর উপাসনা করতাম। তাদেরকে বলা হবে তোমরা মিথ্যেবাদী ও মিথ্যের উদ্ভাবনকারী। জাহান্নামে যাও। এমনকি মারীয়ম তনয় খ্রিস্টও জিজ্ঞাসিত হবেন—হে মারীয়ম তনয় ঈশা, তুমি কি লোকেদের বলেছিলে তোমরা আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করো? তিনি যা উত্তর দেবেন তাতে প্রতিপন্ন হবেন তিনি ও অংশীবাদীর দলে। ফলে তিনিও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন না।

অন্যান্য অংশীবাদীরা—সে হিন্দু হোক, পার্শি, জৈন যেই হোক তারাও এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। এমনকি যেসব সাধু-সন্ন্যাসী-আত্মত্যাগী মানুষেরা আজীবন সাধনা করেছেন, জীবন-যৌবন ঈশ্বর সাধনায় ব্যয় করেছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদেরও সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হবে। তাঁদের পুণ্য ফল শূন্য। কারণ তাঁরা অংশীবাদী। অবিশ্বাসী। নাপাক-বেদ্বীন। বে-ইমানদার। সাজা অবধারিত।

আর এর সঙ্গে সাজা পাবে প্রত্যেক চিত্রকর ও আলোকচিত্রশিল্পী। জীবনের ছবি তোলা ও ছবি আঁকার জন্য। এই শাস্তি ভোগ করতে হবে অনন্তকাল। কারণ বিচার শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুকেও কোতল করা হবে। জান্নাতীরা অনন্ত কাল অ-ন-ন্ত কাল ধরে অপার সুখ-শান্তি-সম্পদ ভোগ করবে। আর অংশীবাদী জাহান্নামীরা অশান্তির

আগুনে পুড়ে পুড়ে মরবে। চিরটা কাল। পুড়তেই থাকবে। জ্বলতেই থাকবে। অনেকে প্রশ্ন করেন—ইসলামধর্ম এত অনমনীয় কেন? ইসলামধর্মবেত্তারা উত্তর দিলেন—গাছ বলবান ও দৃঢ় হলে তার কাণ্ড শক্ত হবে—হবেই।

এখন প্রশ্ন হলো—আলোচনা করতে বসলুম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। এতো ধর্মকথা কেন? উত্তরে বলব—আমি নিরুপায়। 'রবি' থেকে 'রবীন্দ্রনাথ' হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাড়ি দিতে হয়েছে সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ। সে পথ কখনও তপন-তাপনে ভরা। কখনও অবিরাম বৃষ্টিতে পিচ্ছিল। আবার কখন বা বসন্ত বাতাসে আমোদিত। রবীন্দ্রনাথের চেতনায়, বোধে-বুদ্ধিতে, মেধা-মননে, রামকৃষ্ণদেব বর্ণিত এক রাজহাঁস বাস করে। যিনি বস্তু থেকে নির্যাসটুকু শুষে নিয়ে সমৃদ্ধ হন। সেই আলোকে নিজে আলোকিত হন। অন্যকে পথ দেখান। এ আলোচনা চলতে চলতে আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথের এ ধর্ম পরিক্রমার সার্থকতা।

ইসলামধর্মের অন্যান্য বেশ কিছু বিষয়ের সঙ্গে দুটি মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

এক—ইসলামধর্ম সকলকে সমান পঙ্‌ক্তিতে রাখে। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, কোনো প্রভেদ নেই। কোনো শ্রেণি বিভাজন নেই। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন। সকলের জন্য এক মাপকাঠি। এক বিচারদণ্ড। নমাজের স্থলে বাদশা ও নফরের জন্য কোনও আলাদা স্থান নির্দিষ্ট নয়। সেখানে সকলে সমান। সম অপরাধের জন্য সকলের সমান দণ্ড। ভালো কাজের জন্য প্রত্যেকের একই পুরস্কার।

আর একটি বিষয় তাঁকে খুব আকর্ষণ করেছে সে হল নবি হজরত মহম্মদের জীবন। যে জীবনে কোনো বাহুল্য নেই। আড়ম্বর নেই। ঔদ্ধত্য নেই। আছে শুধু মহান ঔদার্য। সীমাহীন ক্ষমা। দিগ্‌দর্শনী আলোর ছটা। এক অত্যাশ্চর্য মহানুভবতা। তিনি ধর্মগুরু। কিন্তু কোথাও গুরুগিরিত্ব নেই। তিনি শুধু আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে সহযোদ্ধার মতো ধর্মযুদ্ধ করেছেন। নিজে সাতাশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আহত হয়েছেন। আহতের সেবা করেছেন। গুরুর মতো উপদেশ দিয়েছেন। বন্ধুর মতো পাশে থেকেছেন। পরম আত্মীয়ের মতো যত্ন করেছেন। এক সাধারণ জীবনযাপন করে দিগ্‌নির্দেশনা করেছেন কীভাবে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হতে হয়। ভোগবাদী সংসারে থেকেও কীভাবে নির্লিপ্ত থাকতে হয়। বহুজনের আপনজন হয়েও কীভাবে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধতে হয়। কীভাবে সমদর্শী হতে হয়। মানবতার ঐশীমন্ত্রে

দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ইসলামধর্মকে কী উচ্চ আসন দিতেন তা বোঝা যায় তাঁর 'হজরত মহম্মদ' প্রবন্ধে তিনি যখন লেখেন—

"ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে ইহার অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।

ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্‌ভাবিত করতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না, তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির উৎসারিত।"

পয়গম্বর হজরত মহম্মদকে তিনি সংকীর্ণ ধর্মের গণ্ডিতে বাঁধলেন না। বিভেদের বেড়ি-জাল পরালেন না। ধর্মীয় দূরতা দিয়ে পরিমাপ করলেন না। তাঁকে প্রণতি জানালেন ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বলে। ঈশ্বর কর্তৃক প্রশংসিত বলে। ঈশ্বরের প্রশংসাকারী বলে।

শুধু সেখানেই থেমে থাকলেন না রবীন্দ্রনাথ। মানবতার মহান বন্ধু বলে পয়গম্বর হজরত মহম্মদকে মালাডোরে বেঁধে নিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে সম্মান জানালেন। শ্রদ্ধা অর্ঘ অর্পণ করলেন সমস্ত সত্তা দিয়ে। হজরত মহম্মদকে কুর্নিশ করলেন সত্যের সমুজ্জ্বল দূত বলে। প্রেরিত পয়গম্বর এবং মানবতার ইতিহাসের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক বলে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে নেই কোনো কার্পণ্য। জড়তা। ছুতমার্গী। এ শ্রদ্ধা শারদ সকালের তপন কিরণের মতো স্নিগ্ধ। সমুজ্জ্বল। অমলিন।

স্রোতধারার মতো শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেই মহামানবের অনির্বচনীয় আশিস প্রার্থী। মানুষের কল্যাণের জন্য। দেশের মঙ্গলের জন্য। উন্নত জীবনের জন্য। একই প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

"—মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশে আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"

আমরা যেন কবির কলমে দেখতে পাই আশার বাণী।

"ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,

নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন...।"

মহাপুরুষের আগমন বার্তায় কবির মন আষাঢ় আকাশের মতো সজল নিবিড়তায় ভরা। আশার আলোকে দীপ্ত। অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সারা জীবন ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অপমানের বিরুদ্ধে—শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম শানিত তরবারি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমা করার দুর্বল মানসিকতাকেও তিনি ক্ষমা করেননি কখনও। তাই তো শুনি—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খড় খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

তিনি শুধু অন্যায়কারীকে শাস্তিযোগ্য বলছেন না; যিনি অন্যায় সহ্য করছেন তাঁকেও সমভাবে দুষছেন। তাঁর বাংলাদেশের গরিব মুসলমান প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন—পীর, পয়গম্বরের প্রতিভূ। আশার আলো। অন্ধকারে জ্যোতিসুন্দর, তাদের দুঃখে তাঁর প্রাণে উথাল-পাথাল করছে। বেদনার মানস অশ্রু। বাংলাদেশে তাঁর জমিদারিতে একটা কথা খুব চল ছিল—রবীন্দ্রনাথ অবস্থাপন্ন 'সাহা'দের হাত থেকে 'শেখ'দের বাঁচাতে এসেছেন।

১৯৩৭ সাল। জীবনের গোধূলিবেলায় রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো গেছেন পাতিসরে। খবর পেয়ে দলে দলে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা দেখতে এসেছে শেষবারের মতো পড়ন্ত সূর্যের আভামাখা রবীন্দ্রনাথকে। নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথকে। বিশ্বকবি গুরদেব রবীন্দ্রনাথকে। মুসলমান প্রজাদের সংখ্যাই বেশি। তারা ভক্তি গদগদ হয়ে বলছে—বাবুমশাই, আমরা আমাদের মহান নবিকে কখনও চোখে দেখিনি। আপনাকে দেখে দু চোখ জুড়োই। তাদের কণ্ঠ আবেগ আপ্লুত। হৃদয়ে ভক্তির ভরা নদী। মুখে প্রাপ্তির অপার তৃপ্তি। আমিন। আমিন। রবীন্দ্রনাথ মনে মনে স্মরণ করলেন সেই সুমহান নবিকে। তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন অন্তরের অন্তস্থল উজাড় করে।

বৌদ্ধধর্মের বোধিবৃক্ষতলে

মনের দীপ্ত মশাল জ্বেলে রবীন্দ্রনাথ উঁকি দিলেন বৌদ্ধধর্মের গর্ভগৃহে। শুনলেন গভীর তত্ত্বকথা—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

যাব আমি বুদ্ধের স্মরণে—ধর্মের স্মরণে—সংঘের স্মরণে।

আরও জানলেন—

সর্বং অনিত্যম্
সর্বং দুঃখম্
দুঃখস্য কারণম্ অস্তি
দুঃখস্য নিবৃত্তি সম্ভব

সব কিছু অনিত্য। ক্ষণস্থায়ী। সব কিছু দুঃখময়। যন্ত্রণাময়। সব দুঃখের নির্দিষ্ট কারণ আছে। হেতু আছে। সব কিছু কার্য-কারণ সম্পর্ক যুক্ত। এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভব। মানুষ ইচ্ছা করলে এই দুঃখ-নদী সাঁতরে উঠতে পারে দুঃখের অপর তীরে। পৌঁছাতে পারে সুখ-দুঃখের সীমানার বাইরে। বুদ্ধদেব বোঝালেন মহা নির্বাণতত্ত্ব। অন্ধকারহীন এক জ্যোতির্ময় অবস্থা। তিনি উপদেশ দিলেন—

সংকখারণং খযং ঞত্বা
যন্তি সন্তি পুবো হতো।

—সংস্কার মুক্ত হলেই মিলবে পরম শান্তি।

আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত অনর্থের মূল। মানুষ তিন অগ্নি—দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি ও লোভাগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে বিষাক্ত তিরবিদ্ধ আহত প্রাণীর মতো ছটফট করছে। আমাদের জন্ম-মৃত্যু সমস্তই কার্য-কারণ সম্ভূত। কারণ না থাকলে যেমন কার্য হয় না, তেমনি কার্য না থাকলে কারণের উৎপত্তিই সম্ভব নয়। একে তিনি

বললেন—'প্রতীত্য সম্যুৎপাদ নীতি'। এই 'প্রতীত্য সম্যুৎপাদ নীতি' বলতে তিনি কি বোঝালেন? তিনি বললেন—অবিদ্যার প্রতি বিশ্বাস হেতু সংস্কারের জন্ম। সংস্কার থেকে — বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকে — বাসনা। বাসনা থেকে — তৃষ্ণা। তৃষ্ণা থেকে — জন্ম। জন্ম থেকে — জরা-ব্যাধি-মৃত্যু।

জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন—এই সমুদায় দুঃখ থেকে মুক্তির আটটি উপায়। যাকে বলা হয় অষ্টমার্গ। কি সেই অষ্টমার্গ? (১) সৎ কর্ম, (২) সৎ চিন্তা, (৩) সৎ জীবন, (৪) সৎ দৃষ্টি, (৫) সৎ বাক্য, (৬) সৎ ব্যবহার, (৭) সৎ সংকল্প ও (৮) সৎ সমাধি।

বুদ্ধদেব দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে মানুষ চিরদিনই অজ্ঞাত ছিল-আছে-থাকবেও। কি সেই পাঁচটি বস্তু? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন—

"জীবিতং ব্যাধি কাল ও চ দেহ মিক্‌খেপনং গতি
পঞ্চেতে জীবলোকস্মিং অনিমিত্তা নঞায়রে।"

মানুষের কতদিন পরমায়ু? কোন্ ব্যাধি কখন আক্রমণ করবে? দিনে না রাত্রে মৃত্যু হবে? জলে না স্থলে? মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম হবে?

কিন্তু মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা। অপার কৌতূহল। মৃত্যু পরজীবন নিয়ে মানুষের মধ্যে অসীম আগ্রহ। ভগবান বুদ্ধের কাছে এই কুহেলিকাময় জগৎ সম্বন্ধে অনেকে জানতে চাইলেন। নানা প্রশ্ন। বিভিন্ন জিজ্ঞাসা। তিনি এই প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন—মনে করো কোনো ব্যক্তি তীব্র বিষযুক্ত তিরবিদ্ধ হল। তার আত্মীয়স্বজন একজন শল্য চিকিৎসক ডেকে আনলেন। তখন কি সেই শরাহত ব্যক্তি বলবেন—যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি কে এই তির মেরেছে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? সে পুরুষ না স্ত্রী? তার বর্ণ কি? গোত্র কি? সে হ্রস্বকায় না দীর্ঘাকৃতি? শ্যামবর্ণ না গৌর বর্ণ? এই তির—তামা-পিতল-রৌপ্য না স্বর্ণ দিয়ে তৈরি? ততক্ষণ আমি কাহাকেও এই তির উৎপাটন করতে দিব না। এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় তবে তির তোলার আগেই সে মারা যাবে। সুতরাং এই সমস্ত অহেতুক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে মানুষের যে 'যাত' দুঃখ তার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি।